প্রথম আলো

তারিখ 13 APR 2009
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ছাত্রলীগে হানাহানি কি পঁচাত্তরের হাতছানি?

মোনায়েম সরকার

বর্তমান সরকার জনগণের বিপুল রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর মাত্র তিন মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশে এমন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, যা সরকারকে বিব্রত ও বিচলিত করার জন্য যথেষ্ট। যেমন শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা। একাধিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ লক্ষ করা গেছে। এই ছাত্র সংঘর্ষের কারণে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসেই শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার দরুন চারজনের প্রাণহানি ঘটেছে, গুরুতর আহতের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এই অস্থিরতা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেহেতু শিক্ষাঙ্গনে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা তার সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে সেহেতু জননেত্রীর ন্যায়ত এই পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় বসার পর পরই শিক্ষাঙ্গনে যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। বিশেষ করে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী নাগরিক, তাদের কাছে বিষয়টি হাল্কা করে দেখার অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, কিভাবে দেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার পরিণতি শুভ হয়নি। বরং দেখা গেছে, শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির অনুকূলে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। কিছুদিন আগে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইজিপি আবদুল খালেকের সঙ্গে দেখা হলে বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা নিয়ে তার সঙ্গে আমার কথা হয়। এক পর্যায়ে খালেক সাহেব আমাকে জানান, স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু খুব দুঃখ করে তাকে বলেছিলেন, দেশে ৮০টি থানা লুট হয়েছে, তার দলের ৫ জন এমপিকে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রলীগ ভেঙে গেছে, জাসদের জন্ম হয়েছে। এ সবের পেছনে তাজউদ্দীনের মদদ থাকতে পারে বলেও বঙ্গবন্ধু নাকি খালেক সাহেবের কাছে খেদোক্তি করেছিলেন। তাজউদ্দীন হয়তো জাসদের সভাপতি হবেন এমন সন্দেহ বঙ্গবন্ধুর মনে হলেও হতে পারে। বলা বাহুল্য, শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা বঙ্গবন্ধুর মনে তার একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত সহযোগী সম্পর্কে যে সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল তা মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই সন্দেহ-সংশয় মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। আরও কিছু অপরিহার্য কারণে তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত হন। তারপরও শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা থেমে থাকেনি। ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের জের ধরে ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল থেকে রাতের অন্ধকারে কোহিনূর, ইদ্রিস, বশরদ, জিন্নাহ, সোহেল, এবাদ ও হোসেন এই ৭ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীকে মহসিন হলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা সেভেন মার্ডার নামে এখনও কথিত হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা এবং দেশের নাজুক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর মনে তাজউদ্দীনের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি এবং তা নিয়ে তৎকালীন পুলিশের আইজি খালেক সাহেবের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেও এতদিনে আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মুজিবনগরের বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সে সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি জড়িত না থাকলেও আওয়ামী লীগের একটি অংশের মদদ ছিল।

আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা লাভের পর সিরাজুল আলম খান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত করে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে ছাত্রলীগকে বিভক্ত করে। পাট গুদামে অগ্নিসংযোগ, থানা লুটসহ নানান অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে ইন্ধন যোগান। সিরাজুল আলম খানের মতোই সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরসহ আওয়ামী লীগের কিছু নেতা ছাত্রলীগের অন্তর্বিরোধে মদদ দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টির নেপথ্যে ভূমিকা রাখেন। এরাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পরিত্যাগ করে মোশতাক, জিয়া এবং এরশাদের সরকারে যোগ দেন। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর দেশে মুক্তিযুদ্ধের ধারা ছিল পর্যুদস্ত। গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল বিপন্ন।

> স্বাধীনতা লাভের পর সিরাজুল আলম খান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত করে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে ছাত্রলীগকে বিভক্ত করে। পাট গুদামে অগ্নিসংযোগ, থানা লুটসহ নানা অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে ইন্ধন জোগান। সিরাজুল আলম খানের মতোই সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান, তাহের উদ্দিন ঠাকুরসহ আওয়ামী লীগের কিছু নেতা ছাত্রলীগের অন্তর্বিরোধে মদদ দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টির নেপথ্যে ভূমিকা রাখেন। এরাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পরিত্যাগ করে মোশতাক, জিয়া এবং এরশাদের সরকারে যোগ দেন। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর দেশে মুক্তিযুদ্ধের ধারা ছিল পর্যুদস্ত। গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল বিপন্ন।

আজ ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে শিক্ষাঙ্গনে যে অস্থিরতা, সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাট গুদামে আগুন, থানা লুট, এমপি হত্যার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত সব ঘটনাকে। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার সূত্র ধরেই ধূর্ত ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রেক্ষাপট রচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এসব ষড়যন্ত্রকারী সব সময়ই মুখোশের আড়ালে থাকে, কিন্তু তারা জন সমাজে, ছাত্র সমাজে, ব্যবসায়ী সমাজে সর্বত্র এমনভাবে মিশে থাকে যে তারা সব সময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এভাবেই তারা অগণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের ধারা অব্যাহত রাখার অপচেষ্টা করে যায়। আজ একইভাবে ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা শিক্ষাঙ্গনে সে ধরনের পরিস্থিতিই যেন সৃষ্টি করেছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার পরিণাম দেখে আজ আশঙ্কা জাগছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাঙ্গামার মাধ্যমে কোন মহল কি এখন চাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টার্গেট করতে? কেননা শেখ হাসিনাকে সরাতে পারলেই তারা আবার দেশে মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে ব্যাহত করতে পারবে এবং গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে পারবে। দেশকে আবার পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নিতে পারবে, যেটি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর। এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা থেকে, বঙ্গবন্ধু-হত্যা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে।

শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা- বিশেষ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে অনেকেই মনে করেন, সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার সরে যাওয়াটা যথেষ্ট নয়। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা থেকে বিরত রাখার জন্য ছাত্রলীগকে উজ্জীবিত করতে হবে। এর জন্য দরকার ভিশন। ষাটের দশকে যেমন ছিল ৬-দফা ও ১১-দফাভিত্তিক ভিশন। আজ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন বা তাত্ত্বিক ভিত্তিতেই ছাত্র লীগকে সংগঠিত করতে হবে। এটা করতে না পারলে ছাত্র লীগের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। যেমনটা সত্তর দশকে সিরাজুল আলম খান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে ছাত্রলীগের কর্মীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন। আজকেও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ভেতরে অপশক্তি ঘাপটি মেরে থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। এরা নানাভাবে উস্কানি ও প্রলোভনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের কর্মীদের বিভ্রান্ত করে বর্তমান সরকার ও শেখ হাসিনাকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে। এটা প্রতিহত করতে হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছে একটা পরিষ্কার রাজনৈতিক দর্শন থাকতে হবে, কেন তারা সংগঠন করবে। আজ এটা স্পষ্ট করতে হবে, চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি করে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ছাত্রলীগ নয়, ছাত্রলীগ হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নের জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রের চার মূলনীতির জন্য এবং '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের জন্য। মোট কথা স্বাধীনতা- তথা মুক্তিযুদ্ধের ধারা দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রলীগকে কাজ করতে হবে। সেভাবেই রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে ছাত্রলীগের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। নেতাকর্মীদের সংগঠনের আদর্শের লক্ষ্যে উজ্জীবিত করতে হবে। এ দায়িত্ব তাহলে কে পালন করবে? সবার মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করার কর্মসূচি প্রয়োজন। এ প্রয়োজন বাস্তবায়িত করতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকেই দৃঢ় পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে হবে। স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে রাষ্ট্র শাসন খুবই কঠিন কাজ। শেখ হাসিনাকে কঠোর অবস্থানেই থাকতে হবে, যা তিনি ইতোমধ্যে ছাত্র সমাজের ক্ষেত্রে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রথম আইজিপি খালেক সাহেবের কথায় ফেরা যাক। তিনি জানান, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, ৮০টি থানা লুট, ৫ এমপি হত্যা, পাটের গুদামে আগুন ইত্যাদি ঘটনা বঙ্গবন্ধুকে দারুণ বিচলিত করে তুলেছিল। এ কারণেই তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগের বৃত্তের বাইরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কৃষক-শ্রমিকসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে সংগঠনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। জাতীয় দলের মাধ্যমে সবার জন্য দলের দ্বার উন্মোচন করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এমনকি আওয়ামী লীগকে বিলুপ্তও করেছিলেন।

আমরা জানি, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা কায়েম করে বাংলাদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি দেশে সমবায় ভিত্তিক অর্থনীতি এবং জেলায় জেলায় উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ আধুনিক গ্রাম বা ক্লাস্টার ভিলেজ গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ধনী-গরিবের বৈষম্য কমিয়ে আনার এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত বলেই স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে আর সময় দেয়নি; তারা ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল।

আর সেই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ভারতের প্রখ্যাত লেখক-সাংবাদিক মুলকরাজ আনন্দ এক ভারতীয় কাগজে *টিউনিক অব মুজিব উইল ব্লিড* অর্থাৎ মুজিবকোর্ট রক্তাক্ত হবে- এই শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেটা হাতে পেয়ে আইজি খালেক দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে। নিবন্ধটি দেখার পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- আল্লাহর ইচ্ছা যা হওয়ার হবে। কিন্তু এখনকার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। স্বাধীনতার ৩৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জিত হয়নি। গণতন্ত্রকে হত্যা করে সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে দেশকে আবার পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চলছে। এ অবস্থায় সবকিছু অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না। এ জন্য সতর্ক থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সোনার বাংলা কায়েমের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে ছাত্রলীগকে উজ্জীবিত করা না গেলে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা দূর হবে না, জাতিকে আবার বড় ধরনের খেসারত গুনতে হতে পারে।

১১ এপ্রিল ২০০৯